শিক্ষা সমাজ দেশ

মানসিকতার উন্নতি ছাড়া দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সুদূরপরাহত

– অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ

আমাদের সমাজে কোনো মানুষকে আর্থিকভাবে সৎ হতে দেখলেই তাকে আমরা সৎলোক বলে প্রচার করি। সততার অনেক উপাদানের মধ্যে তিনি একটি গুণাবলীর ধারক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সততার উপাদানগুলো পেতে গেলে উইকিপিডিয়া ঘেটে এখনই দেখতে পারেন। সততা বলতে কমপক্ষে আরো আটটি গুণ একজনের মধ্যে থাকতে হবে; তারপর কাউকে আমরা সৎ বলতে পারি, যেমন– নৈতিক নীতি, মূল্যবোধের প্রতি আপসহীনতা, সত্যবাদিতা, সম্পূর্ণতা বা অখণ্ডতা (ইন্টিগ্রিটি), বিশ্বস্ততা, নম্রতা, উদারতা ইত্যাদি। রাজনীতিকদের জন্য জবাবদিহিতা ও জনসেবাও সততার গুণ। এখন থেকে আমরা রাজনীতিকদের জন্য জবাবদিহিতা ও জনসেবাকে সততার অবশ্যম্ভাবী গুণ বলে বিবেচনা করবো। আমি আরো দুটো গুণ রাজনীতিকদের জন্য আরোপ করতে চাই– ত্যাগ ও দায়বদ্ধতা। জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা কিন্তু সমার্থক নয়। দায়বদ্ধতা হচ্ছে– কর্তব্য পালনে দায়িত্ববোধ; জবাবদিহিতা হচ্ছে– কোনো কাজের দায়িত্ব গ্রহণ ও তৎসংক্রান্ত প্রশ্নাদির জবাব দিতে প্রস্তুত থাকা। প্রশ্ন জাগে, এদেশের রাজনীতিক ও কর্মীদের কতজনের মধ্যে সততাসহ জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা আছে? মহান রাজনীতিকদের দলীয়প্রধানরা আদৌ কি এসব কথা ভাবেন? না-কি সে মোতাবেক নেতা-কর্মীদের সংশোধন করার চেষ্টা করেন? তাহলে দেশের উন্নতির আশা করি কীভাবে? কল্পনায় বিরিয়ানি খেয়ে তো কোনো লাভ নেই। তাইতো আমরা 'কাজ করি বেহদ্দ, ডুবে মরি গোষ্ঠীসুদ্ধ'; নাকি দেশসুদ্ধ বলবো? আমরা কাগজে-কলমে কিছু কথা তালিকাভুক্ত করে সংস্কারের ওয়াদা পূরণ করি। রাজনীতিকদের মন-মানসিকতা, অর্থাৎ মগজ সংস্কারের কথা কখনো বলি না। এটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত-উন্নয়নের যে একটা বড় প্রতিবন্ধকতা, তা ভেবেও দেখিনা। আবার 'সততা' শব্দটাই তো আমাদের সমাজ ও মগজভিত্তিক অভিধান থেকে দিনে দিনে হারাতে বসেছে। তা উন্নতি কীভাবে সম্ভব? আমাদের রাজনীতি তো সততার এ গতিপথ অনেক আগ থেকেই হারিয়েছে। যতই সামনে এগোচ্ছি, মরুভূমির তপ্ত বালুচরে সততার অস্তিত্ব ও স্রোতধারা বিলীন হতে চলেছে।

আবার সততার এসব প্রতিটা উপাদান মানবতাবোধের ওপর নির্ভরশীল। মানুষের মধ্যে সুপ্ত মানবতাবোধ পরিবেশ ও সুশিক্ষা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হয়। মানবতাবোধের ভিত্তি তৈরি করে ধর্মীয় মূল্যবোধ। ধর্ম হাজার হাজার বছরের পুরোনো একটা অতি পরীক্ষিত সংগঠন। সততা ও মূল্যবোধ তৈরিতে এ সংগঠন অদ্বিতীয়। যদিও ভোগবাদ ও বস্তুবাদী সংস্কৃতিতে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। ফল ও প্রভাব আমরাই ভোগ করছি। ভোগবাদী সমাজে এসব ভেবে দেখার সময়ের খুব অভাব। ভয় হয়, এসব কথা বেশি বেশি লিখলে কেউ আবার আমাকে ঠাট্টাতামাশা করে দার্শনিক উপাধি না দিয়ে দেয়! আমি সামাজিক ও মানসিক এসব ঘটনা সাদা দৃষ্টিতে দুচোখ দিয়ে দেখতে চাই। রাজনীতিক ও সংস্কারকদেরও একচোখা না হয়ে দুচোখ দিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। এই যে সমাজ ও রাজনৈতিক সংস্কারের যে সুযোগ আমরা ঘটনাচক্রে বৈষম্য ও শোষণের শেষপ্রান্তে এসে পেয়ে গেলাম; এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। এমন সুযোগ সহজে আর আসবে বলে মনে হয় না। কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলে দরকারি সংস্কার আর হবে না। একটা অভ্যাস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, সাধারণভাবে পরিবর্তন রাজনীতিকরা করতে চায় না। এজন্য অন্তবর্তী সরকারকেও যেমন চলমান রাজনীতিকদের সত্য-অপ্রতিবন্ধ আশ্বাস আন্তরিকতার সাথে দিতে হবে; আবার রাজনীতিকদেরও ধৈর্য ধরে অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতা করে প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো করিয়ে নিতে হবে; নিজেদের স্বার্থে না হলেও দেশের স্বার্থে জিদ না ধরে করতে হবে। নিজেদের নেতা-কর্মীদের মগজও পরিবর্তন করাতে হবে। নইলে অন্যদিন লিখেছিলাম 'তেলের নামে তেল গেল, ফ্যাচ্ করলো না' কথাই সার হবে। গত ১৫ বছরের বিরোধী দলগুলোর কৃতকর্মে দলের নেতা-কর্মীদের শিক্ষা, নৈতিকতা, অনুকরণীয় নেতৃত্বের গুণাবলীর বড্ড অভাব ছিল। সে বিষয়ে সাবেক বিরোধী দলগুলোর কেন্দ্রীয় নেতারা সতর্ক ও যত্নবান কি-না? তাই রাজনীতিকদের রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার কথা এ কারণে বলি, এদেশ দুর্নীতিতে ভরে গেছে। রাজনৈতিক সরকার ব্যবস্থায় উপযুক্ত কন্ট্রোলিং সিস্টেমের মাধ্যমে দুর্নীতি ৫০ শতাংশ কমানো মানে দেশ ৫০ শতাংশ নিশ্চিত এগিয়ে যাওয়া। এদেশে রাজনীতিকদের সাথে সরকারি কর্মকর্তা ও সুযোগসন্ধানী

ব্যবসায়ীরা একসাথে গাঁটছড়া বেধে নির্বিঘ্নে দুর্নীতিতে নামে, এতে জনগোষ্ঠী অসহায় হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে কোনো যাদুর বাঁশি নেই যে, ফুঁ দিলেই এতদিনের মজ্জাগত দুর্নীতির ব্যাধি হঠাৎ করেই ভালো হয়ে যাবে। আবার একথা সত্য, নামমাত্র সংস্কার করে নির্বাচন সুষ্ঠু হলেই দেশ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হয়ে যাবে, একথা বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের স্বভাবের পরিবর্তন আনতে হবে।

বৈধ আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং জ্ঞান একটা সমাজ ও দেশকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গড়তে পারে। আমরা অবৈধ টাকার পাহাড় দিয়ে দেশ-বিদেশে নিজের সম্পদ গড়ি। জ্ঞান নেই; জ্ঞান আসে সুশিক্ষা থেকে, সমাজে সুশিক্ষাও নেই, তাই জ্ঞানের রাজ্যেও ভাটার টান। এখানেই সমস্যা। দুর্নীতি দূর করে সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোতে সুনীতি আনতে গেলে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চাহিদা মতো করতে হবে। এতে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে। উভয় শিক্ষার কাজই একসাথে শুরু করতে হবে। সমাজ কাঠামো মজবুত হবে। সুশিক্ষিত মানুষ রাজনীতিতে আসবে। কর্মপ্রচেষ্টা চলতে থাকলে কমপক্ষে সাত বছরের মধ্যে আশা করা যায় এ জাতিগোষ্ঠী শিক্ষার আশানুরূপ পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে। তবে সরকারের শিক্ষাকমিটি গঠন ও এর পরিচালনা দেখে আগেভাগেই বোঝা গেছে, এ যাত্রায়ও উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সমাজ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত হবে। শিক্ষাসংস্কারও নামকা ওয়াস্তা হবে বলে মনে হচ্ছে। এতে এদেশের জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তা শিক্ষার মাধ্যমে পৃথক করার কাজ কতটুকু হবে, আমরা সন্দিহান। আমি ভাবছি সম্মিলিতভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ (inclusive society) ও একীভূত শিক্ষাপদ্ধতির (integrated education) মডেল এদেশে কত দ্রুত প্রয়োগ করা যায় এবং মানসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষা নিশ্চিত করে পুরো ব্যবস্থার ফল কত তাড়াতাড়ি জনসমাজে নিশ্চিতভাবে পৌঁছে দেয়া যায়; আর শিক্ষাব্যবস্থা তৈরিতে কর্মরত জনশক্তি ভাবছে ভিন্নভাবে– তাদের মতো করে, যা এদেশের জাতি-গোষ্ঠীর স্বকীয় সত্তায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হবে। এতে পরিণতি 'যাহা পূর্বং, তাহাই পরং' হতে বাধ্য। শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নেও আগের মতো নিশ্চিত গলদ থেকে যাবে। কারণ কথায় আছে, 'উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়'। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক একটা অনুরোধ অন্তর্বর্তী সরকারকে করতে পারি, যা শুনতে একটু তিক্ত মনে হবে– শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের রূপরেখা যেন আগের মতো কোনো ধর্মবিদ্বেষী লোকজন দিয়ে করানো না হয়; কারণ জানি, এদেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ভিন্ন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কমপক্ষে ৯৯.৫০ শতাংশ লোক ধর্মে বিশ্বাসী। অনেকে সরাসরি ধর্ম পালন করে না, কিন্তু শিক্ষার মধ্যে ধর্মবিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি সাধারণ মানুষ পছন্দ করে না।

অর্থনীতিতে গ্রেশামের মুদ্রাবিষয়ক নীতি পড়েছিলাম। এই নীতির মূল কথা হলো: 'খারাপ টাকা ভালো টাকাকে বাজার থেকে হটিয়ে দেয় ও নিজে জায়গা করে নেয়'। আমাদের দেশেও অনুরূপ হয়েছে: নীতিহীন-অসৎ প্রতারণাসর্বস্ব রাজনীতি সৎ-দেশসেবামূলক রাজনীতিককে দেশ থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। সৎ ও সুশিক্ষিত লোকগুলো লাঠিয়ালবাহিনীর প্রধানদের অত্যাচারে ও মিডিয়ার অপমানজনক-বিদ্বেষপূর্ণ চরিত্রহননের ভয়ে কোটরের প্যাঁচার মত ঘরের কুঠরিতে ঢুকে বসে আছেন। অফিস-আদালত ও সমাজেও একই অবস্থা। আমরা নিজেরা ভালো হতে চাইনে, অন্যকে ভালো হতে বলি। আত্মজিজ্ঞাসার ঘর ফাঁকা। ব্যক্তি পর্যায়েও যা, রাজনৈতিক দলের পর্যায়েও তা। এজন্যই বার বার স্বাধীন হলাম, পতাকা ও স্বার্বভৌমত্বের অহঙ্কার ছাড়া তেমন কোনো লাভ হলো না। ২০২৪-এ ছাত্র-জনতার সফল বিপ্লব হতে দেখলাম, বিপ্লবে নিজে সশরীরে ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা করলাম, তার আগে হুমকি–ধামকিকে তুচ্ছজ্ঞান করে কলম দিয়ে অনেক বছর ফ্যাসিবাদের তক্তে সাধ্যমতো আঘাত করলাম, অথচ বিপ্লবী সরকার গড়তে ভুল করে ফেললাম, আবার বিপ্লবের ফসল কতটুকু দেশের উন্নতির ঘরে তুলতে পারবো, তা নিয়ে এখনো সন্দেহমুক্ত হতে পারলাম না। একথা ফেলে দেবার মত নয় যে, অন্তর্বর্তী সরকার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। বর্তমান বিপ্লবী সরকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈপ্লবিকতা নেই। বিষয়টা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যৌক্তিকতাসহ কানাঘুষা করতে প্রায়ই শুনি। সরকারের অভ্যন্তরে ও বিভিন্ন বিভাগে ফ্যাসিবাদের কেনা দোসর এখনোও সক্রিয়। সরকার এ বিষয়ে শক্ত অবস্থানে যেতে পারছে না, এটা সরকারের দুর্বলতা। অনেক ক্ষেত্রে এই দুর্বলতার কারণ অভ্যন্তরীণ কিনা শনাক্ত করা যাচ্ছে না। সরকার অনেক ক্ষেত্রে নমনীয়তার প্রশ্রয় দিচ্ছে। এটা বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য নয়। তবে সরকারের বিদেশ নীতির সফলতা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রশংসনীয়।

আরেকটা প্রসঙ্গ প্রায়ই শুনতে হচ্ছে, তা হলো দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা। আগেও লিখেছি, এত ছোট দেশে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা ভালো ফল বয়ে আনবেই না। তখন কেউ আবার দেশকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করতে বলবেন, যা হবে দেশের জন্য আত্মঘাতি। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা না করে রাষ্ট্রপ্রধান একজনের পরিবর্তে একটা কাউন্সিলকে করা যায়, যার নাম এর আগের লেখায় 'সুপ্রিম কাউন্সিল' দিয়েছিলাম। এ কাউন্সিল তৈরি করতে অরাজনৈতিক পেশাদার সংগঠন থেকে নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কাউন্সিল নির্বাচন করা যায়। এতে রাজনৈতিক সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়, সরকার ও বিরোধীদলের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা তদারকী ও তত্ত্বাবধান করা যায়, এক্ষেত্রে নির্বাচন পরিচালনার জন্য 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' গঠনের তখন আর প্রয়োজন পড়ে না। বিস্তারিত অন্য একটি কলামে লিখেছিলাম, কিন্তু প্রস্তাব গ্রহণকারির কোনো আগ্রহ দেখছি না। তাছাড়া নতুনের প্রতি মানুষের আগ্রহ কম, আবার রাজনীতিকরা রাষ্ট্রের (সুপ্রিম কাউন্সিল) কাছে নিজেদের কাজ-অকাজের জন্য দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা করতে সহজে রাজি হবে বলে মনে হয় না। অথচ এছাড়া এদেশের মুক্তি সুদূরপরাহত।

আমার জানা একটা ঘটনা এরকম: ছেলের বিয়ে দেবার জন্য বাপ আর খালু গেছেন মেয়ে দেখতে। পাত্রী পছন্দ হয়ে যাওয়াতে বাপ দ্বিতীয়-শুভ শাদি-মোবারক সম্পন্ন করে নতুন বউ নিয়ে বাড়িতে হাজির। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র-জনতার জীবনের বিনিময়ে বিপ্লব করে, আবার তারা নিজেরাই নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার ঘোষণা আমাকে শঙ্কিত করে তুলছে। একাজ করে আমরা অদূরদর্শীতার স্বাক্ষর রাখতে যাচ্ছি। এতে আমরা অন্য সাধারণ রাজনৈতিক দলের মতো একটা রাজনৈতিক দলে পরিণত হব। বছর না যেতেই পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি-কোন্দল, পরিণামে ব্রাকেট-সর্বস্ব দল হয়ে এবং জনসাধারণের জন্য চেতনাসমৃদ্ধ বিপ্লবী দল ক্রমশ ঠুটো জগন্নাথে পরিণত হবার আশঙ্কা দেখা দেবে। দেশের জন্য সত্য ও ত্যাগের সারথী হয়ে কাজ করে আবার পক্ষভুক্ত হওয়া নিতান্তই বেমানান। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় মনোযোগী হতে হবে। আবার নতুন দল গড়তে অন্য দল ভাঙনের চেষ্টা ঘৃণ্য অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। পতিত সরকার অনেকবার এ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। এ বিষয়ে পতিত সরকারের অনুকরণ এড়িয়ে যাওয়া সম্মানের ব্যাপার। নতুন দল গঠন নিয়ে অর্ন্তদ্বন্দ্ব পতিত সরকারের ফিরে আসাকে সম্ভব করেও তুলতে পারে। বরং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অরাজনৈতিক ছাত্রজোট গড়ে তোলা যেতে পারে, তারা একই ছাতার নিচে দেশ গড়ার জন্য কাজ করবে। তারা মর্যাদার সাথে টিকে থাকবে। সব অন্যায়-অব্যবস্থার প্রতিবাদ করবে এই সদাজাগ্রত বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজ। নির্বাচিত সরকারের কর্মের তদারকী ও তত্ত্বাবধান দেশবাসীর পক্ষ থেকে করবে, এটাই হবে আপাতত তাদের পবিত্র দায়িত্ব।

(৩১ ডিসেম্বর '২৪ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ
Web: pathorekhahasnan.com